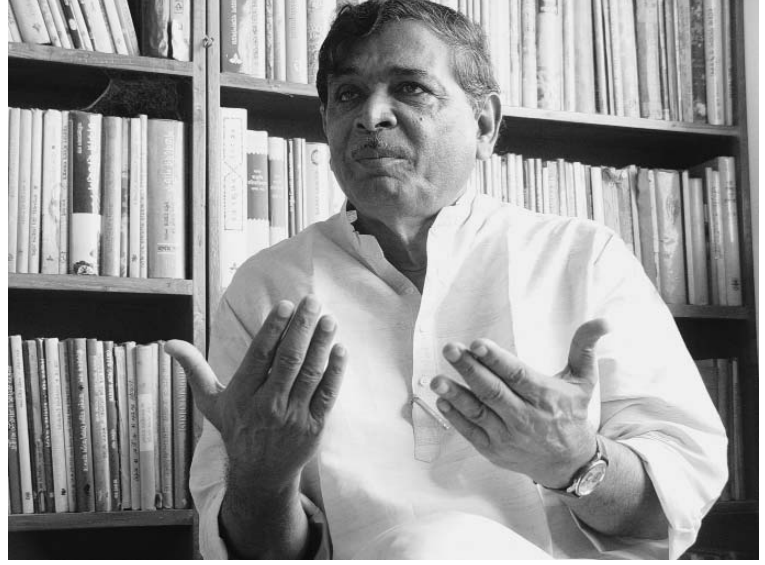


Ôth thv×v tm gti  
bv| th `ej, fxi",  
cj vqbc i fmB gti  
tewk | Avgvř` i  
wm×vš-ıbtž nte  
teřP \_vKřev bv  
gti hvřevŎ

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ



### গোলাম মোর্তোজা

স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে হাসছেন, বিজয়ের হাসি। এমনটা শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অসম্ভব সুন্দর করে কথা বলেন। তবে কথার চেয়ে কাজ বেশি করেন। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কথা বলছি।

গড়ে তুলেছেন একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠানটির বিশালতা আয়তনে নয়, কর্মকাণ্ডে।

সম্প্রতি তিনি পেয়েছেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এশিয়ার নোবেল খ্যাত 'র্যামন ম্যাগসেসে' পুরস্কার পেয়ে উজ্জ্বল করেছেন বাংলাদেশের মুখ। প্রমাণ করেছেন বাংলাদেশ শুধু দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, আমলা আর পচে যাওয়া বুদ্ধিজীবীদের দেশ নয়। কর্মঠ মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষও আছেন এ দেশে। ২ সেপ্টেম্বর ম্যানিলায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে দেয়া হয়েছে এ পুরস্কার। নিজের বিবেকের কাছে পুরোপুরি সৎ থেকে, সারা জীবন আর্থিক অসচ্ছলতাকে মেনে নিয়েছেন হাসি মুখে।

হাসি মুখে ঘুরছেন দুয়ার থেকে দুয়ারে, বই হাতে। বই পড়িয়ে অন্ধকার দূর করতে চান তিনি। অনেকটা সফল হয়েছেনও। আজ সারা দেশে বিস্তৃত হয়েছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড। দেশের বাইরে লন্ডন, নিউইয়র্কসহ আরো কিছু শহরেও চলছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মসূচি।

আমাদের সমাজে কাছ থেকে দেখে শ্রদ্ধা করা যায় এমন মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নেই বললেই চলে। খুব সামান্য যা আছে, তার মধ্যে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র অন্যতম।

অথচ এই মানুষটিকে আমরা যথাযথভাবে সম্মান দেখাতে পারিনি। যেটা পেরেছে ফিলিপাইন। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় এতো পুরস্কার! তার একটিও পাননি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। অলেখকরা পান বাংলা একাডেমী পুরস্কার। স্বাধীনতা পুরস্কার দেয়া হয় রাজাকারকে। সেখানে নাম থাকে না আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার না পেলেও পেয়েছেন কোটি মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। যা তার কর্মউদ্যোগের নিয়ামক।

র্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার পাওয়ার পর আমাদের নীতিনির্ধারকরা নিশ্চয় কিছুটা লজ্জা পেয়েছেন। আগামীতে তারা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে পুরস্কার দেয়ার চেষ্টা করে আরো কিছুটা লজ্জা নিশ্চয়ই পাবেন।

**সাণ্ডাহিক ২০০০ :** আজ আপনার সাক্ষাৎকার নেয়ার পেছনে একটা উপলক্ষ আছে। সে প্রসঙ্গে পরে কথা বলব। তার আগে জানতে চাই, যে সময়টাতে বসে আমরা কথা বলছি, সেই সময়টা নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম বিশ্লেষণ আছে। এমন একটা সমাজে আমরা এখন বসবাস করছি, যেখানে নানা রকম ঘটনা দিনের পর দিন ঘটেই চলছে। কিন্তু আমাদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। একজন মানুষ অন্য একজনকে সবার চোখের সামনে পিটিয়ে মেরে ফেলছে। কিন্তু কারো কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। এই সময়টাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

**আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ :** ১৯৭১ সালে আমরা যেদিন স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম সোনার বাংলা পেয়েছি। কিন্তু পরে আমাদের ভুল ভেঙেছে। পরে আমরা টের পেয়েছি যে সোনার বাংলা আকাশ থেকে আসে না। যে বাংলা আমরা পেয়েছিলাম সেটা মাটি-কাদার বাংলা। তাকে এখন সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে। আমাদের সবচেয়ে বড় যে সমস্যা সেটা হচ্ছে কোনো কালেই আমরা আসলে স্বাধীন ছিলাম না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শক্তি আমাদের শাসন করেছে। পাল, সেন, পাঠান, মোগল, ব্রিটিশ, পাকিস্তানিরা সবাই আমাদের শাসন করেছে। তার ফলে যেটা হয়েছে, নিজেদের

ভাগ্য তৈরি করার সুযোগ আমাদের আসেনি। আমাদের ভাগ্য নিয়ে অন্যরা খেলা করেছে। দখল করে এদেশ থেকে মুনাফা নিয়েছে। আমাদের ভাগ্যের দিকে তাকায়ওনি, নির্মাণও করেনি। আমরাও নিজেদের ভাগ্য নির্মাণ করার সুযোগ পাইনি। এ চিন্তাটাই কোনোদিন আমাদের মাথায় ছিল না। রাষ্ট্র যে একটা ব্যাপার, প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত মানুষের উচ্চতর সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র যে প্রয়োজন, এটা আমাদের মাথার মধ্যেই কোনোদিন আসেনি। রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। আমাদের ছিল গ্রামের অভিজ্ঞতা। গ্রামের মোড়ল, টাউট, এদের অভিজ্ঞতা। আজকেও আমাদের রাষ্ট্রের প্রধান বা ওপরের স্তরে যারা

আছে। তাদের মনমানসিকতার মধ্যে একটা গ্রামীণ, আদি, ক্ষুদ্র সংগঠন, তার যে নেতা, মানসিকতা, প্রকৃতি, স্বভাব লক্ষ্য করি।

**২০০০ :** গ্রামীণ মানসিকতার চিত্রে হয়তো একটা টাউট শ্রেণী আছে। কিন্তু পাশাপাশি সরল, সাধারণ, ভালো মানুষের নেতৃত্বও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি।

আ. আ. সায়ীদ : কিন্তু গ্রামীণ পরিবেশে যেটা নেই সেটা হচ্ছে লুণ্ঠনকারী। আমাদের পুরো রাষ্ট্র কিন্তু সম্পদ সৃষ্টির একটি জগৎ। আর সেখানে লুণ্ঠনকারী আছে। যারা এই রাষ্ট্র পরিচালনা করে তারা লুণ্ঠনকারীদেরই প্রতিনিধি। আমরা আগে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষিত মানুষ পেতাম। সুশিক্ষিত, আদর্শবান মানুষ পেতাম। আজকে সেখানে আমরা শুধু ব্যবসায়ী পাচ্ছি। যে ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই লুণ্ঠনকারী। আমার বক্তব্য হচ্ছে, স্বাধীনতার সময় আমরা একটা পতাকা পেলাম। আর এই পতাকাকে রাষ্ট্র বলে ভুল করলাম। রাষ্ট্রটা আমাদের এখন গড়ে তুলতে হবে।

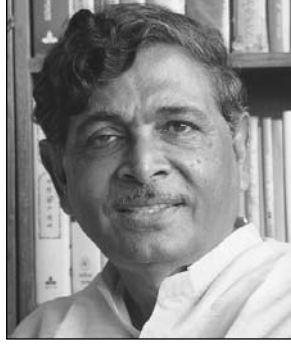
**২০০০ :** পতাকাকে রাষ্ট্র ভেবে ভুল করলাম কেন বলছেন?

আ. আ. সায়ীদ : পতাকা রাষ্ট্রের একটি প্রতীক মাত্র। রাষ্ট্রের পূর্ণ শক্তি পতাকার মধ্যে থাকে না। পতাকার শক্তি তখনই বাড়ে যখন রাষ্ট্রের শক্তি বাড়ে। শুধু একটি পতাকা রাষ্ট্রের শক্তিকে বা সম্পদকে বেঁধবকে ধারণ করে। প্রথম যেটা হলো সম্পূর্ণ নৈরাজ্যের মধ্যে আমাদের দেশটা পড়ে গেল। যুদ্ধ পরবর্তীতে যে বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য, অরাজকতা তৈরি হলো, বিধ্বস্ত একটি দেশ, সমস্ত কিছু যেখানে ভেঙে পড়েছে, সেটাকে পুনর্গঠিত একটি রাষ্ট্রে পরিণত করা আমাদের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হয়নি। জাপানে, জার্মানিতে সম্ভব হয়েছিল। কারণ দীর্ঘদিনের একটি রাষ্ট্র কাঠামোর একটি শক্তিশালী ভিত তাদের ছিল। সুতরাং যেই মাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে আবার তারা রাষ্ট্রকে গড়ে তুলেছে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা না থাকায় আমরা এটা পারিনি। যেকোনো সৃষ্টির প্রথমে একটা নৈরাজ্য আসে। তখন আমাদের দেশে যে নৈরাজ্য চলছে, তা রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার প্রথম স্তর। এই নৈরাজ্যই ধীরে ধীরে আমাদেরকে শৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যাবে। এত অল্প সময়ে সেটা সম্ভব নয়।

**২০০০ :** এই ৩০ বছর কি খুব কম সময় মনে হয় আপনার কাছে?

আ. আ. সায়ীদ : ৩০ বছরকে খুব বড় বললে কিন্তু ভুল হবে। কারণ, আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বয়স ১৭-১৮-এর বেশি নয়। এ কথাটা মনে রাখতে হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী মানে যে শ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত দেশের,

সমস্ত জায়গায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে, গণতান্ত্রিক দেশে। সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী আমাদের সদ্যজাত। আমাদের এখানে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল। সেটা বিশেষ দশকে। সেই বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত সেটা এক সময় পাকিস্তান আন্দোলন করেছে। তারাই আবার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করেছে। তারাই একান্তরের



আমাদের ছোটবেলাটা কেটেছে অত্যন্ত সুশীল, সুন্দরভাবে। সুস্থ মূল্যবোধ্যক সঙ্গে নিয়ে বড় হয়েছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সেটা ব্রিটিশ আমলের পদানত জাতির মেরুদণ্ডহীন মূল্যবোধ

গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছে। তারা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে।

**২০০০ :** ১৯৪৭ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এরাই দেশের বিভিন্ন ক্রাইসিসে ভূমিকা রেখেছে।

আ. আ. সায়ীদ : ঐ যে ২০-৩০ দশকে যে একটি ছোট্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকশিত হতে লাগলো, সেটা একটা চিন্তাশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কারণ পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় ধরনের শাসনের একটা চাপের মধ্যে পড়লাম। এর থেকে মুক্তির পথ কি এটা তারা অন্বেষণ করেছে। এভাবেই একটা চিন্তাশীল মধ্যবিত্তকে সেই সময় আমরা গড়ে উঠতে দেখি। তারপর স্বাধীনতার পরে আমরা চরম অরাজকতার মধ্যে পড়ি। বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ি। লুণ্ঠনের জগৎ যখন জেঁকে বসলো আমাদের ঘাড়ে, তখন এই মধ্যবিত্ত ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকলো। তাদের মধ্যে যারা উচ্চতর তারা বিদেশে চলে গেল, বিত্তের, সম্পদের হাতছানি যাদের টেনে নিয়ে গেল, তারা একভাবে শেষ হয়ে গেল। আর যারা নৈতিকতাকে আঁকড়ে ধরে দেশে থেকে গেল তারাও দারিদ্র্যের চাপে ধীরে ধীরে নিষ্পেষিত হতে হতে এক সময় শেষ হয়ে গেল।

**২০০০ :** নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি করলো।

আ. আ. সায়ীদ : আরো নিচে নেমে গেল। আমি নিজেও সেই মধ্যবিত্ত যারা কম্প্রোমাইজ করিনি। অর্থনৈতিকভাবে আমিও তার উদাহরণ। তবুও তো আমি বেঁচেছি। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব বাঁচতে পারেনি। হয় তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, নয় তারা অবৈধ পথে যেতে বাধ্য হয়েছে। উচ্চতর লোভের হানছানিতে তারা সমস্ত মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। একান্তরের পরে ১০, ১২, ১৩ বছর সম্পূর্ণ নৈরাজ্যের ভেতর ছিল দেশটি। রাজনৈতিক নৈরাজ্য। সেটা পার হয়ে এসে এরশাদের আমলের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের বিত্তের বিকাশের ধারা

অক্ষুটভাবে ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো আশির দশকের মাঝামাঝি।

**২০০০ :** এটা কি বিশেষ কারো শাসন ব্যবস্থার সুফলের কারণ?

আ. আ. সায়ীদ : না, না, এটা স্বাভাবিকভাবেই, প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়েছে। একটি রাষ্ট্র যখন হয়েছে তার সম্পদ হবে। তার সূচনাও হয়েছে একান্তরের পরে। ধীরে ধীরে নানা রকম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার

ভেতর দিয়ে এগিয়েছে। প্রথমে সে শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। আস্তে আস্তে দেখা গেল আশির দশকের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে তাদের মধ্যে একটা নতুন, হয়তো অবৈধতা থেকে তৈরি, মূল্যবোধের অবক্ষয় তাদের মধ্যে বিপুল, তবুও একটা পুঁজি আসলো। ওই পুঁজির ধাক্কাই এরশাদকে ক্ষমতাসূচ্য করেছিল। যেমন ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্তের যে পুঁজি, সেটাই কিন্তু একদিন পাকিস্তানকে আঘাত করেছে। স্বৈরতন্ত্রকে আঘাত করেছে।

**২০০০ :** '৭১ থেকে '৮০ পর্যন্ত এই সময়টাতে বিকশিত হয়েছে।

আ. আ. সায়ীদ : তারপর নতুন বড় একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং আগের মধ্যবিত্ত শ্রেণী মিলিত হয়ে একটা শক্তিতে রূপ নেয়। যেটা গণতান্ত্রিক শক্তি হয়ে ওঠে। আর তার মধ্য দিয়েই স্বৈরতন্ত্রের পতন হয়। আমাদের সমাজে গণতন্ত্র আসে। সেই গণতন্ত্র নিয়ে ঠিক ওই মুহূর্তে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না। সুতরাং সেই মধ্যবিত্তের বয়স এখন ১৫ বছর। একটা জেনারেশন ৩০ বছর তো যেতে দিতে হবে।

**২০০০ :** আপনি যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকশিত হওয়ার কথা বললেন এবং বিভিন্ন সময়ে ধাক্কা দেয়ার কথা বললেন...

আ. আ. সায়ীদ : ধাক্কা দিচ্ছিল। '৫২, '৫৪, '৬২, '৬৯ সালে ধাক্কা দিচ্ছিল। বড় ধাক্কাটা দিতে পেরেছে ১৯৭১ সালে।

**২০০০ :** বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে যদি বলি, '৯০-এ এসে মধ্যবিত্ত একটু বিকশিত হলো, একটু ধাক্কা খেল। ধাক্কা খেয়ে স্বৈরাচারের পতন ঘটালো। কিন্তু তার পরের চিত্রটা কী?

আ. আ. সায়ীদ : তার পরবর্তী চিত্রটা হচ্ছে একটি দুর্বল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

**২০০০ :** '৯০-এর পর কি তারা দুর্বল হয়েছে নাকি আরো শক্তিশালী হয়েছে?

আ. আ. সায়ীদ : অবস্থান আরো

শক্তিশালী হয়েছে। কিন্তু আপাতত ভাবে এতোটা শক্তিশালী হয়নি যে সে গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকশিত রূপ দিতে পারে। আমরা একটা স্বৈরাচার থেকে চলে আসার পথে গণতন্ত্রের নামে ভিন্ন ধরনের রিল্যাক্স স্বৈরাচারের মধ্যে এখন বাস করছি। যেটা বংশগত। দলের মধ্যে কোনো গণতন্ত্র না থাকায়, সমস্ত রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হয়েছে। এখন রাজনৈতিক দলে থাকার উপায় হলো পদলেহন, তোয়াজ। আমাদের নেতাদের নামের আগে এখন দশটা বিশেষণ যে দিতে পারবে সেই থাকবে। যে প্রশ্ন করবে, জিজ্ঞাসা করবে, জানতে চাইবে, সে ছিটকে পড়বে। যে পদলেহন করতে পারবে সে মর্যাদাসম্পন্ন লোক হতে পারে না। সুতরাং এই মর্যাদাহীন লোকগুলো দিয়েই এখন রাজনৈতিক দলগুলো তৈরি হয়েছে। দলের পদলেহন করতে পারলাম না তো আমি দলে নেই। প্রত্যেক দলেরই তাদের সদস্যের পুণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকলেও তাদের পাপের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সে জন্যই আমরা আজকে গণতন্ত্র পেলেও, সেই গণতন্ত্রকে

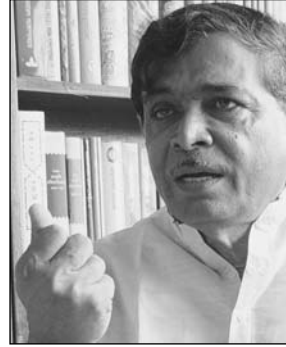
একটা মানুষের শক্তি হলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। একটা অবৈধ মানুষকে ধরা এবং তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা নেই। সেটা আজও নেই। তবে লক্ষ্য করছি ধীরে ধীরে সেটা হচ্ছে। ধরা যাক সন্ত্রাসের যে অবস্থা আমাদের। খুন হতে হতে এক সময় উপলব্ধি করা হলো যে এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দরকার। সে জন্য দ্রুত বিচার পদ্ধতি করা হলো। আমার মনে হয় ইতিমধ্যেই ৬০০ লোকের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

**২০০০ : দেয়া হয়েছে কিন্তু কার্যকর হয়নি।**

আ. আ. সায়ীদ : কার্যকর হয়নি, কিন্তু এর মধ্যে যদি ৩০০ লোকের মৃত্যুদণ্ডও কার্যকর হয় সেটাও বিশাল ব্যাপার। যে প্রেসিডেন্টকে ৩০০ মৃত্যুদণ্ডের কাগজ সহ করতে হবে তার পাগল হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমি বলছি চাইলে যে কোনো কাজ করা যায়। সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের জন্যে র‍্যাব গঠন করা হলো। এর আগে অপারেশন ক্লিনহার্ট চলেছে। ছোট সন্ত্রাসী দমনের জন্যে বড়

যন্ত্রের অপরাধকে ফেইস করার কোনো উপায় নেই। আমি মনে করি আমরা আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রের একটা ন্যূনতম কাঠামো গড়ে তুলতে পারবো। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেখানে কাজ করার সুবিধা পাবে। যেমন একটা বিল্ডিং তৈরি হয়, মাটির নিচে তার অজস্র ইট, ক্রংক্রিট প্রোথিত থাকে। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না যে এ বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে থাকার পেছনে তার নিচে কী পরিমাণ সম্পদ আছে। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের এই যুগটা যাচ্ছে মাটির নিচে পুঁতে রাখা ভিত্তিতে। পরবর্তী প্রজন্ম ওই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে একটা বড় জাতি তৈরি করার স্বপ্ন দেখতে পারবে এবং কার্যকর করারও সুযোগ-সুবিধা পাবে।

**২০০০ : প্রাসঙ্গিকভাবেই একটা কথা জানতে চাই যে, যারা বয়সে একটু প্রবীণ, তাঁদের কথায় সব সময় একটা বিষয় স্পষ্ট উঠে আসে যে, তাঁদের সময়টা খুব ভালো ছিল। এখন সে অবস্থা নেই। কিন্তু আপনার কথা থেকে এই ভাবনার ঠিক উল্টো চিত্রটা লক্ষ্য করছি।**



আ. আ. সায়ীদ : আমিও স্বীকার করবো যে, আমাদের সময়টা অত্যন্ত ভালো ছিল। আমাদের ছোটবেলাটা কেটেছে অত্যন্ত সুশীল, সুন্দরভাবে। সুস্থ মূল্যবোধসহ সঙ্গ নিয়ে বড় হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সেটা ব্রিটিশ আমলের

**ভালো সময় বলে কোনো সময় নেই। কোনো সময়ই সু-সময় নয়। প্রত্যেকটা সময়ের মধ্যেই অনেক শূন্যতা থাকে। অনেক নীচতা থাকে, পাপ থাকে। সে যুগের মানুষকে সেই পাপ এবং পচনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়**

সত্যিকার অর্থে বিকাশ ঘটাতে পারিনি। আমি নিশ্চিত আমাদের পরের প্রজন্ম তা পারবে। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা আমরা বলছি- সে মধ্যবিত্ত যেদিন শেষ হবে, প্রথম প্রজন্ম পার হয়ে যখন দ্বিতীয় প্রজন্ম পা দেবে তখনই আরেকটা ধাক্কা আসবে গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল এবং বিকশিত রূপ দেয়ার লক্ষ্যে।

**২০০০ : ১৯৭১ সালের পর নৈরাজ্য এবং লুণ্ঠনের কথা বললেন। আপনি নিজে একজন সংগঠন করা মানুষ। সংগঠন করতে গিয়ে হয়তো অনেক সময় অনেক পরিস্থিতিতে পড়েন। যেখানে কৌশলে চলতে হয়। পরিস্থিতির কারণে হয়তো অনেক সময় অনেক কথা বলতে পারেন না। এখন আপনার কাছ থেকে সেই চিত্রটা জানতে চাই। ১৯৭১ সালের পর যে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, লুণ্ঠন চলছিল, একটি নতুন স্বাধীন দেশের জন্য কি সেটা প্রত্যাশিত ছিল?**

আ. আ. সায়ীদ : এটা প্রত্যাশিত ছিল। কারণ ঐ নৈরাজ্য এবং লুণ্ঠন যাতে না হয় সে জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্র কাঠামো দরকার ছিল। সেই সুশৃঙ্খল, শক্তিশালী রাষ্ট্র কাঠামো তো আমাদের ছিল না। একটা শূন্য ক্ষেত্র ছিল। যে যা খুশি তাই করেছে। কোনো আইন নাই। আদালতে তাকে ধরার উপায় নাই।

সন্ত্রাসীর প্রয়োজন হচ্ছে।

একটা সময় দেখলাম মাঠ, পুকুর, জলাশয় সব দখল হয়ে যাচ্ছে। এটা ঠেকানোর কোনো পথ নেই। তখন আমরা আন্দোলন করেছি। একটা কঠোর আইন হয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে। তার ফলে আমরা যেকোনো জলাধার দখল করার বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারি। এখন ধীরে ধীরে রাষ্ট্র হচ্ছে। রাষ্ট্র মানে একটি পরিবার। সার্বভৌম একটি জাতি। তার সংবিধান, তার আইন কানুন। এই আইন-কানুনগুলোই আসলে রাষ্ট্র। আর সেই আইন-কানুনকে বাস্তবায়িত করার জন্যে প্রশাসন যন্ত্র। সেই আইনগুলোই এখন ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। আমাদের এই ঢাকা শহর ইটের অরণ্য হয়ে গেল। কারণ কোনো আইন নেই। একটা বাগান, একটা সুন্দর শহর পেতে হলে প্রত্যেকটা বাড়ির মধ্যে কতখানি ফাঁকা রাখতে হবে -এর কোনো আইন ছিল না। এখন হচ্ছে। আমরা রাষ্ট্রের দিকে এগুচ্ছি। আমরা বিশ্বব্যাংকের অনেক সমালোচনা করি। হয়তো করার বহু কারণও আছে। আবার দু'একটা ভালোও আছে। কারণ এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ডি করাপশন সংস্থা এটা পৃথিবীর সব দেশে আছে। এটা না থাকলে একটা দেশের অপরাধকে, অস্তত প্রশাসন

পদানত জাতির মেরুদণ্ডহীন মূল্যবোধ।

সেই কারণে দেশে যখন স্বাধীনতা এলো, কোটি কোটি সুযোগ সামনে এসে দাঁড়ালো। মানুষ বাঁপিয়ে পড়লো। এক ধাক্কায় সেই মূল্যবোধ উড়ে যেতে পেরেছে। কারণ ঐ মূল্যবোধকে রক্ষা করার মতো যে রাষ্ট্র যন্ত্রের দরকার ছিল, সেটা ছিল না। চল্লিশ, পাঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে খুব ভালো মূল্যবোধ ছিল।

কিন্তু সেটা একটা পরাধীন জাতির মূল্যবোধ। আজকে এখন আমাদের যে মূল্যবোধ সেটার মধ্যে অনেক গন্ডগোল, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা থাকতে পারে, কিন্তু সেটা একটা স্বাধীন জাতির মূল্যবোধ। আগের মূল্যবোধও একদিনে আসেনি। এই মূল্যবোধও সময় নেবে। কিন্তু তোমাকে আসতেই হবে হে মূল্যবোধ।

**২০০০ : ভালো সময় আর খারাপ সময় বলা হয়। এই ভালো সময়ের সংজ্ঞাটা কী?**

আ. আ. সায়ীদ : ভালো সময় বলে কোনো সময় নেই। কোনো সময়ই সু-সময় নয়। প্রত্যেকটা সময়ের মধ্যেই অনেক শূন্যতা থাকে। অনেক নীচতা থাকে, পাপ থাকে। সে যুগের মানুষকে সেই পাপ এবং পচনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। তুমি আমার কাছে এসেছো কারণ আমি একটা

পুরস্কার পেয়েছি সে জন্য। কিন্তু আমরা তো পুরস্কারের জন্য কাজ করি না। আমরা কাজ করি আমাদের চারপাশের দুঃখগুলোকে, যে দুঃখগুলো আমাদের তাড়িত করে সেগুলোর একটা সাধ্যমতো জবাব দেয়ার জন্য। প্রত্যেক যুগে আমাদের চারপাশে এমন দুঃখ থাকবেই। কখনো কখনো হয়তো এর পরিমাণ বেড়ে যায়। ষাটের দশকেও আমরা ওরকম মূল্যবোধহীনতা, ধস- এসব শব্দ ব্যবহার করতাম। যদি লন্ডন শহরে ১৮৯৯ সালের কোনো একটা ড্রয়িং রুমে একটা রেকর্ডার পেতে রাখা যেত তাহলে জানা যেত যে ঐ যুগেও তখনকার তরুণরা, বয়স্করা একটা ধসের কথা, বিষাদময় চিত্রের কথা বলছে। কারণ মানুষ সব সময় বিষাদময়তাকে, শূন্যতাকে চিহ্নিত করতে চায়। যাতে সে অন্ধকারকে সংগ্রাম করে অতিক্রম করতে পারে। তবে আমাদের অন্ধকারটা একটু বড় ধরনের। কারণ হঠাৎ আমরা একটি রাষ্ট্র পেলাম যার কোনো রকম যোগ্যতা আমাদের ছিল না। সুতরাং এর জন্য কিছুটা সময় তো দিতেই হবে। যদি সত্যিকারের স্বাধীনতা যুদ্ধ করতাম তাহলে ২০ বছর যুদ্ধ করতে হতো। আমরা খুব অল্প সময়ে রাষ্ট্র পেয়েছি। রাষ্ট্র কাঠামোর যে কনসেপ্ট সেটা আর্মস স্ট্রাগল দিয়ে মানুষ পেতে পারে না। এটা নিজেদের দুঃখ-যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে গড়ে তুলতে হয়।

**২০০০ : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকারি বা রাজনৈতিক শূন্যতার পাশাপাশি একটি দিকের উন্নয়নও আমরা লক্ষ্য করবো। সেটা হচ্ছে এনজিও। এটা কি আমাদের জাতীয় উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?**

আ. আ. সায়ীদ : জাতির কোনো বড় বিকাশ এনজিও সেক্টরের মাধ্যমে ঘটেছে বলে আমি মনে করি না। তবে অনাহার, দুস্থ দারিদ্র্য, কষ্ট মানুষের তার থেকে এনজিও নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাহায্য করেছে।

অন্তত সাময়িকভাবে। আগে তো বাঁচতে হবে। তারপর না যুদ্ধ। এনজিও সেক্টর এই বাঁচতে সাহায্য করেছে। তবে এনজিও সেক্টরের মাধ্যমে বড় কোনো জাতীয় সমৃদ্ধি আসবে- এটা আমি মনে করি না। উন্নয়ন তো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সামগ্রিক কর্মের ফসল। শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক আন্দোলন, সামাজিক চেষ্টি, এগুলোর মাধ্যমেই তো হয়। এটা সব দেশেই হয়। এটা দিয়ে একটা জাতি সমৃদ্ধি অর্জন করে।

**২০০০ : আপনার কথায় বারবার রাষ্ট্রের কথা, রাষ্ট্র চিন্তার কথা আসছে। বাঙালিদের চিন্তাটা, মূল্যবোধ এটা তো বোধহয় খুব দুর্বল ছিল না। যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।**

আ. আ. সায়ীদ : খুবই শক্তিশালী ছিল।



আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্রবিবর্জিত। ঐ রাজনীতির মধ্যে যাওয়া যে কোনো মানুষের পক্ষে কঠিন। বিবেকের কথা, মনুষ্যত্বের কথা, আদর্শের কথা বলা সেখানে সম্ভব নয়। হয় সেই দলের কর্তৃপক্ষের দাসত্ব করতে হবে, না হলে ফিরে আসতে হবে

কিন্তু সেগুলোর পেছনে কোনো রাষ্ট্র ছিল না। মূল্যবোধের পেছনে একটা পরাধীন জাতি ছিল। তাদের যে মূল্যবোধ ছিল, সেটা একটা রাষ্ট্রের মধ্যে এসে একইভাবে কার্যকর থাকবে, এটা নাও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নজরুল ইসলামের অনেক বড় বড় মূল্যবোধ। কিন্তু আজকের এই স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটটাই সম্পূর্ণ আলাদা। তখন তো শত্রু হোক, মিত্র হোক মাথার ওপর অন্য কেউ ছিল। সুতরাং সেই মূল্যবোধের সঙ্গে আজকের মূল্যবোধের যে পার্থক্য সেই মূল্যবোধ আমাদের নিজেদের শ্রম, ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, ঘাম, রক্ত, সংগ্রাম দিয়ে তৈরি করতে হবে। এই দুই মূল্যবোধকে এক করলে চলবে না। ঐ মূল্যবোধ চেয়ারে বসে বসেও সম্ভব ছিল। কিন্তু রক্ত না দিয়ে এই

মূল্যবোধ অর্জন সম্ভব নয় স্বাধীন জাতির।

**২০০০ : একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য, পরিবর্তনের জন্য যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকবে, মূলত তাদের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলনেই পরিবর্তন আসবে। কিন্তু আমাদের সমাজে যারা মেধাবী, ভালো মানুষ হিসেবে স্বীকৃত তাঁদের বড় একটা অংশ জোর দিয়ে গর্বের সঙ্গে বলে যে আমি রাজনীতি করি না বা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নই। মানসিকতা এমন হলে পরিবর্তনটা আনবে কে?**

আ. আ. সায়ীদ : আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্রবিবর্জিত। ঐ রাজনীতির মধ্যে যাওয়া যে কোনো মানুষের পক্ষে কঠিন। বিবেকের কথা, মনুষ্যত্বের কথা, আদর্শের কথা বলা সেখানে সম্ভব নয়। হয় সেই দলের কর্তৃপক্ষের দাসত্ব করতে হবে, না হলে ফিরে আসতে হবে। আমার

মনে হয় বহু মানুষ সে জন্য নিজেদের রাজনীতি থেকে গুটিয়ে রেখেছে। তাঁরা জানেন সেখানে গেলে তাঁদের মূল্যবোধ, বিবেক, আদর্শ, স্বপ্ন, কোনো কিছুই রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং আমরা যেমন রাজনীতি থেকে সরে এসেছি কিন্তু আরেকটা ক্ষেত্রে কাজ করছি।

**২০০০ : আপনি তো সেভাবে সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না কোনো দিন। আপনার মতো করে আলাদা একটা কাজ করছেন। কিন্তু আমি যাদের কথা বলছি, তাঁদের বড় একটা অংশ তো সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। সেই অর্থে তাঁরা কিছুই করছেন না, মাঝে মাঝে কিছু কথা বলা ছাড়া।**

আ. আ. সায়ীদ : সব দেশেই রাজনীতির

মধ্যেও সিভিল সোসাইটি থাকে। রাজনীতির মধ্যেও সেই সুযোগ থাকে, অবকাশ থাকে যে কোনো প্রশ্ন করার, যে কোনো বিবেকের কথা বলার, মনুষ্যত্বের ধারক হওয়ার। একটি দলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেও কিন্তু ন্যায়ের কথা বলা যায়। ইংল্যান্ড পার্লামেন্টে দলের বিরুদ্ধে ভোট দেয়া যায়। আমাদের এখানে তো সেটা নেই। তার ফলে যাঁরা অ্যাকটিভিস্ট হয়ে উঠতে পারতেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখতে পারতেন, তাঁরা রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে হয়তো আত্মহত্যা করছেন। নিরুপায় আত্মহত্যা।

২০০০ : জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া?

আমাদের অবস্থা অনেকটা হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর মতো। হবুচন্দ্র রাজার কাজই ছিল প্রতিদিন সকালে উঠে একটি করে সমস্যা সৃষ্টি করা। আর সারা জাতির কাজ ছিল সেই সমস্যার সমাধান করা, আর তার পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে বলা, আমাদের মেরে ফেল

আ. আ. সায়ীদ : অনেক সময় বিরোধী শক্তি যদি প্রবল হয়ে ওঠে তখন তো পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। প্রচণ্ড বাড় উঠেছে, তখন তো মানুষ রাস্তা ত্যাগ করে। মানুষ বের হবে, নিজেকে জয়ী করবে এটাই তো মানুষের প্রবণতা। কিন্তু এক একটা সময় আসতে পারে যখন মানুষকে গুটিয়ে ফেলতে হয়, গুটিয়ে যেতে হয়। সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে, অন্ধকার বিবরের মধ্যে তিলে তিলে শেষ হয়ে যেতে হয়।

২০০০ : ওই যে সরে যেতে হয়, পালিয়ে যেতে হয় বা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে যেতে হয়। রাস্তা তো আর খালি থাকে না। ভালো লোকগুলো সরে এলে খারাপ লোকগুলো তো সে রাস্তা দখল করে নেয়। তাহলে পরবর্তী সময়ের সম্ভাবনাটা কিসের আলোকে হবে?

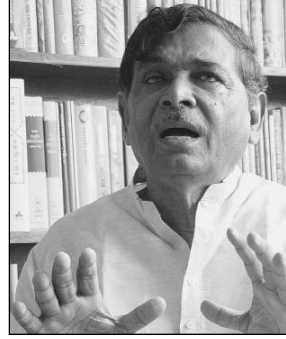
আ. আ. সায়ীদ : মনীষীর কথা দিয়ে যদি বলি নলেজ ইস পাওয়ার। পাওয়ার বলতে বুঝিয়েছিলেন নলেজ হচ্ছে টাকা। যার নলেজ হবে তার অর্থের পরিমাণ বাড়বে। আর যার অর্থের পরিমাণ বাড়বে তার ক্ষমতার পরিমাণ বাড়বে। আমাদের যে বৃত্ত তৈরি হচ্ছে তা একটা লেবেল পর্যন্ত আছে। আরেক ধাপ এটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিভূই গণতন্ত্রের দাবি করবে। নতুনভাবে তখন গণতন্ত্রকে পেতেই হবে। না হলে এর বিরুদ্ধে নব্বই সালের মতো গণঅভ্যুত্থান করতে হবে। বিত্তের নিজের একটা শক্তি আছে। এই বৃত্ত '৬৯-৭১কে জয় করেছে। এরশাদের পতন ঘটিয়েছে। এই বৃত্তই আরো ডেভেলপমেন্টের দিকে যাবে। গণতন্ত্র তখন অনিবার্য। উন্নত গণতন্ত্র তখন বাধ্যতামূলক হবে।

২০০০ : এখন যে সময়টা আমরা পার করছি, এই যে মেধাবী বা ভালো মানুষ হিসেবে যাঁরা দূরে সরে থাকছেন তাঁরা নিরাপদ তো নয়ই বরং তাদেরসহ সমগ্র জাতিকে কঠিন মূল্য দিতে হবে সামনের সময়টাতে।

আ. আ. সায়ীদ : কঠিন মূল্য নয়। ধীরে ধীরে দেখা যাবে তাঁরা এই বৃত্তের ওপর ভর করে, খুব অস্পষ্টভাবে অস্ফুটভাবে এই রাজনীতিতে আসছে।

২০০০ : তাঁরা তো রাজনীতির বাইরে থেকেও নিরাপদ নন। আক্রান্ত তো হচ্ছেন।

আ. আ. সায়ীদ :



রাজনীতিতে এলে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। যে যোদ্ধা সে মরে না। যে দুর্বল, ভীরু, পলায়নপর সেই মরে বেশি। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা মরে যাবো না বেঁচে থাকবো, বিজয়ী হবো। আমরা ইরাকের খবর পাচ্ছি। প্রতিদিন একশ-দুইশ' মানুষ মারা যাচ্ছে। কিন্তু এরা যোদ্ধা না। যে আক্রমণের কৌশল জানে সে পালানোর কৌশলও জানে। আমার মনে হয় ধীরে ধীরে বৃত্তের শক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো উচ্চতর গণতন্ত্রের দাবি আসবেই। আজকে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি চিৎকার করছে হরতাল বন্ধ করার জন্য। আগামী বিশ বছরের মধ্যে আমরা হয়তো এরকম আরো ৭টা সেক্টর দেখবো বাংলাদেশে। ৭টা অত্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী সেক্টর দেখবো। তখন ৭টা শক্তির মিলিত দাবি থাকবে। তখন কি বিরোধী দল এভাবে হরতাল চালিয়ে যেতে পারবে? কারণ ঐ বৃত্তের শক্তিই গণতন্ত্রকে অনিবার্য করে তুলবে।

২০০০ : ঐ বৃত্তের সঙ্গে মধ্যবিত্তের সম্পর্ক কী?

আ. আ. সায়ীদ : মধ্যবিত্ত ঐ বৃত্তের ফিলোসফার। বৃত্তের শক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু সে জানে না কোন পথে চলতে হবে। মধ্যবিত্ত দার্শনিক হিসেবে ঐ পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করে।

২০০০ : আপনি যে সুশীল সমাজের কথা বলেছেন, আমাদের দেশে এই সুশীল বা সিভিল সমাজের যাঁরা নেতৃত্বে থাকেন, তাঁদের বক্তব্য বা আচরণের সঙ্গে একজন রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য বা আচরণের কোনো পার্থক্য তো দেখি না।

আ. আ. সায়ীদ : এটার কারণ, রাষ্ট্র এই

সিভিল সোসাইটিকে গ্রাস করেছে।

২০০০ : সিভিল সোসাইটি রাষ্ট্রের কাছে গ্রাস হয়ে গেছে?

আ. আ. সায়ীদ : হ্যাঁ, গেছে। এটা আজ নয়, আশির দশকের পর থেকেই এই সিভিল সোসাইটি ধীরে ধীরে কোনো না কোনো রাষ্ট্রীয় শাখা, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের একীভূত করে ফেলেছে। এতেও কোনো অসুবিধা হতো না, যদি রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক হতো। যেহেতু নয়, ঐ বুদ্ধিজীবীরা যারা কোনো না কোনো দলের, তারা স্বাধীন বক্তব্য বা মতামত দেয়ার অধিকার রাখে না ঐ দলীয় মানুষদের কারণে। সুতরাং আজকের বুদ্ধিজীবীরা সবাই দলীয়। হয় বিএনপি'র বুদ্ধিজীবী, নয় আওয়ামী বুদ্ধিজীবী। জামায়াতের বুদ্ধিজীবী এখনও বাজারে বের হয় না। তারাও হয়তো বেরিয়ে যাবে। তবে এই বুদ্ধিজীবীরা পাকচক্রে পড়ে দলীয় হয়েছে। নিজেদের ইচ্ছায় না। দলের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার তাদের নেই।

২০০০ : কথাটা কি তাহলে এভাবে বলা যায় যে, যাদের আমরা এতো দিন বুদ্ধিজীবী বলে জেনে এসেছি তারা আসলে সেই মাপের মানুষ নন, বুদ্ধিজীবী নন?

আ. আ. সায়ীদ : না, তা নয়। সে খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে। একজন ব্যায়ামবীরও কিন্তু কাদার মধ্যে পড়ে যেতে পারে। আমার মনে হয় তাদের অবস্থা তাই হয়েছে।

২০০০ : আপনার কি মনে হয় না, বুদ্ধিজীবীদের বড় একটা অংশ নিজেদের স্বার্থে এমন একটা অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়েছে?

আ. আ. সায়ীদ : পৃথিবীতে স্বার্থ নেই, এটা তো হতে পারে না। আমি ইন্টারভিউ দিচ্ছি আমার স্বার্থে, তুমি ইন্টারভিউ নিচ্ছ তোমার স্বার্থে। এই পৃথিবী স্বার্থের দ্বারা চালিত। এর মধ্যে উচ্চতর স্বার্থ, নিম্নতর স্বার্থ। নিম্নতর স্বার্থ মানে শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক। উচ্চতর মানে অনেকের মিলিত স্বার্থ। তাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা মিলিত স্বার্থে বিশ্বাস করেন। এঁদের মধ্যে আবার অনেকে আছেন যাঁরা অত্যন্ত স্বাধীনভাবে কথা বলেন। এই অবস্থায় কয়জন মানুষ এটা পারবে? বুদ্ধিজীবীর কথা যদি বাদও দেই, তাহলে সাধারণভাবে কয়জন মানুষ পারবে?

২০০০ : এখানে বোধহয় হুমায়ুন আজাদ উদাহরণ হিসেবে আসতে পারে।

আ. আ. সায়ীদ : হুমায়ুন আজাদ হতে পারে, যে কেউ হতে পারে। যেকোনো মানুষ এখন স্পষ্টভাবে কথা বলতে গেলে সমস্যা হয়। একজন সাংবাদিক যদি স্পষ্ট কথা বলে তারও সমস্যা হয়। এ কারণে তোমাকেও

কিছুদিন আগে কাফনের কাপড় পাঠানো হয়েছিল। এখানে স্বাধীনভাবে কথা বলা মানেই বিপদ ডেকে আনা।

২০০০ : ধর্মীয় মৌলবাদ এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। আমরা বলতে চাই না বা স্বীকার করতে চাই না যে, বাংলাদেশ একটা ধর্মীয় মৌলবাদ রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু এটা সত্যি যে তারা ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। মুক্তবুদ্ধির মানুষগুলো ক্রমেই তাদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। আপনি এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন?

আ. আ. সায়ীদ : ধর্মীয় মৌলবাদকে আমি খুব একটা বড় বিষয় বলে মনে করি না। এজন্য আজকের পৃথিবীর যে অগ্রযাত্রা, ধর্মীয় মৌলবাদ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। বিজ্ঞান, টেকনোলজি, মানুষের চিন্তা-চেতনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, এসব নিয়ে, মূল্যবোধ নিয়ে, স্বপ্ন নিয়ে সামনের দিকে এগুচ্ছে। তার একদম বিরুদ্ধে গিয়ে, কারো পক্ষে দীর্ঘদিন টিকে থাকাটা কঠিন। হয়তো নানা সূত্র থেকে নানা সহযোগিতার কারণে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের এখানেও ধর্মীয় মৌলবাদ একটা অবস্থানে আসতে পারে। তবে আমি মনে করি না যে এরা বেশিদিন টিকবে।

২০০০ : আমরাও এটা মনে করতে চাই না। কিন্তু গত ২-৩ বছরে তাদের যে কর্মকাণ্ড দেখি, রাষ্ট্র এদের শেল্টার দেয়। খারাপ মানুষ এমনিতেই খারাপ কাজ করে, তারপর যদি রাষ্ট্রের শেল্টার পায় তাহলে কি আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায় না?

আ. আ. সায়ীদ : আপাতদৃষ্টিতে থেকে যায়। রাষ্ট্র শেল্টার দেয়ার চেয়েও জনগণ শেল্টার দিচ্ছে কি না সেটা বড় কথা। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যদি শেল্টার দেয় তাহলে তার বিকাশ হতে পারে। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। জনগণ যদি চায় যে সবাই মৌলবাদী হয়ে যাবে তাহলে অন্য ঘটনা।

২০০০ : জনগণ যে চায় না নির্বাচন তার প্রমাণ। কিন্তু তারপরও আমরা একটা খারাপ সময় পার করছি।

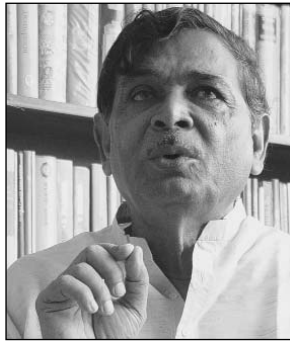
আ. আ. সায়ীদ : খারাপ সময়ও বলবো না আমি। হয়তো নৈরাজ্যপূর্ণ সময় বা অস্থির সময়। কিন্তু এর ভেতর দিয়েও কাজ হচ্ছে। একবার ড. ইউনুস বলেছিলেন, সরকার ছাড়াই জনগণ এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষের যে শ্রম, রক্ত, চেষ্টা, সাধনা, প্রয়াস সেটা তো রয়েছে। তার ফল আমি দেখবোই। কুয়াশা যতো বড়ই হোক আর মেঘ যতো বড়ই হোক- এটা কেটে যাবেই। মানুষের এই চেষ্টা, এই সংগ্রাম তো দেখতে পাবোই।

২০০০ : মানুষ তো এখন সেই অর্থে

রাষ্ট্রের কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না। মানুষ চায় তার কাজে রাষ্ট্র যেন কোনো সমস্যার সৃষ্টি না করে। এটাই একমাত্র দাবি এখন রাষ্ট্রের কাছে।

আ. আ. সায়ীদ : আমাদের অবস্থা অনেকটা হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর মতো। হবুচন্দ্র রাজার কাজই ছিল প্রতিদিন সকালে উঠে একটি করে সমস্যা সৃষ্টি করা। আর সারা জাতির কাজ ছিল সেই সমস্যার সমাধান করা, আর তার পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে বলা, আমাদের মেরে ফেল। আমাদের অবস্থাটা এখন সেই দিকে যাচ্ছে। একটি রাষ্ট্র জাতিকে সাহায্য করবে কি, জাতির উদ্যমকে এগিয়ে নেবে কি, স্বপ্ন দেখাবে কি, রাষ্ট্র একটা জাতির সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে একটি ধ্বংসকারী শক্তি হিসেবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সেজন্য এগিয়ে যাওয়াটা আমাদের দেরি হচ্ছে। আগেই বলেছি, আমাদের রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা নেই। আমরা জানি না যে রাষ্ট্রের রাজা একজন পিতা, পালক। রাজার দায়িত্ব জনকল্যাণ। এই ধারণাটাই আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে নেই। আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে আত্মকল্যাণ হচ্ছে কাজ। বিগত সময়ে যে মন্ত্রীর এসেছে আমাদের দেশে, এদের মধ্যে আত্মকল্যাণ না চেয়ে জাতির কল্যাণ চেয়েছে এমন ৫ ভাগ মন্ত্রী হবে কি না আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সেই রাজার হৃদয়টাই তৈরি হয়নি আমাদের এখানে। মন্ত্রী, আমলা সবাই। আমি একটি বিরাট দালান বানিয়ে ফেলতে পারি হঠাৎ লটারিতে টাকা পেয়ে। একটা প্রাসাদ বানাতে পারি। কিন্তু সেখানে থাকার জন্য যে হৃদয় দরকার সেই হৃদয়টা

পাওয়া তো মুশকিল। আমরা একটা রাষ্ট্র পেয়ে গেছি, সরকার পেয়েছি,



আমি একটি বিরাট দালান বানিয়ে ফেলতে পারি হঠাৎ লটারিতে টাকা পেয়ে। একটা প্রাসাদ বানাতে পারি। কিন্তু সেখানে থাকার জন্য যে হৃদয় দরকার সেই হৃদয়টা পাওয়া তো মুশকিল। আমরা একটা রাষ্ট্র পেয়ে গেছি, সরকার পেয়েছি, জাতি পেয়েছি। কিন্তু সেই সরকারের যোগ্য হতে হবে তো আমাদের

জাতি পেয়েছি। কিন্তু সেই সরকারের যোগ্য হতে হবে তো আমাদের।

২০০০ : এবার পুরস্কারের প্রসঙ্গ। মেনে নিচ্ছি পুরস্কারের জন্য কেউ কাজ করে না বা করেন না। তারপরও কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার কি আপনাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করেছে কখনো?

আ. আ. সায়ীদ : কেন যেন কোনো স্বীকৃতির ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। এটা আমার ব্যক্তিগত মানসিক সমস্যা। বৈকল্যও হতে পারে। আমি মনে করি, যে মানুষটা আর কিছুদিন পর পৃথিবী

থেকে চলে যাবে তার স্বীকৃতি হলেই কি আর না হলেই কি? আমি এতে বিশ্বাসী নই। রবীন্দ্রনাথের মতো এতো বড় মানুষ শেষ জীবনে গিয়ে বলছেন 'হে উদাসীন পৃথিবী, আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে তোমার নির্মম পদপ্রান্তে রেখে যাই আমার পদচিহ্ন।' এমন যে রবীন্দ্রনাথ তাকেও চলে যেতে হয়েছে। আমি কে? একটা জায়গায় অবশ্য আমার ভালো লেগেছে যখন দেখলাম আমার বন্ধুরা খুশি হয়েছে। তারা আনন্দিত হয়েছে। তাদের অনাবিল আনন্দের শ্রোত আমার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এটা আমাকে গঙ্গান্নানের স্বাদ দিয়েছে। গঙ্গান্নানে যেমন পুণ্য হয় তেমনি। এটা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পেয়েছে, আমি পেয়েছি, একে যারা ভালোবাসে তারা পেয়েছে। আমাকে যারা ভালোবাসে তারা পেয়েছে। মানে যতো মানুষ এটা পছন্দ করেছে।

২০০০ : সে অর্থে বাংলাদেশও পেয়েছে।

আ. আ. সায়ীদ : তা হয়তো... আমি হয়তো আর ক'দিন পর মারা যাবো। রবীন্দ্রনাথ এতো বড় মানুষ, কালীঘাটের শ্মশানে পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন। তার এক মিনিট বেশি জীবন তো তিনি পাননি। তাহলে আর এসব দিয়ে কী লাভ। কিন্তু যেহেতু আমি সচেতন অনুভূতিশীল মানুষ। আমার চারপাশের দুঃখগুলোর প্রত্যুত্তর আমি দিতে চাই। আমি বসে থাকতে রাজি নই। আমার সামনে একটা বিপর্যয় দেখে নির্বিকারভাবে চলে যাবো এটা আমি পারবো না। আমি তার জবাব দিতে চাই। এটাকেই, এই চেষ্টাটাকে আমি জীবনের অর্থ মনে করি।

২০০০ : যার যেটা পাওয়ার কথা নয়, সে সেটা পায়। যার পাওয়ার কথা সে পায় না। এটা তো একটা সমস্যা। কাজের একটা স্বীকৃতি তো অবশ্যই থাকা উচিত।

আ. আ. সায়ীদ : হ্যাঁ, মানসিক স্বীকৃতি বোধহয় পাওয়া উচিত। কারণ যতোই বলি স্বীকৃতি দরকার নেই, কিন্তু মানুষের মধ্যে বোধহয় এ ধরনের অসহায় বোধ কাজ করে। আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় মশা গেল না, হাঁদুর গেল কেউ তা লক্ষ্যও করি না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সেটা হয় না। এজন্য আমাদের সুন্দর জামা পরতে হয়। সুন্দর গাড়ি কিনতে হয়। আমাকে না দেখে আমার গাড়িটা দেখ। এই অসহায়বোধ থেকেই ওটা হয়। আমার পায়ের নিচে মাটি নেই। সামনে মৃত্যু। আমি কে? আমি নিজেকে চিনতে পারি

না। কেউ চেনে না। এজন্য মানুষের রিকগনেশন দরকার। যোগ্য মানুষকে রিকগনেশন দিতে হয়। আমাদের এখানে অযোগ্য রিকগনাইজড হয়। যোগ্য প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ ঐ যে রাষ্ট্র নেই। সুশৃঙ্খল, সুন্দর, আদর্শভিত্তিক, যোগ্যতাভিত্তিক রাষ্ট্র আমরা বানাতে পারিনি।

**২০০০ : রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা বললেন, নিজের না থাকার কথা, মৃত্যুর কথা বললেন। আপনার মধ্যে কি তাহলে মৃত্যুচিন্তা প্রবল হয়ে উঠছে?**

আ. আ. সায়ীদ : আমার মৃত্যু চিন্তা শৈশব থেকেই। এখনই বরং কমে গেছে। কারণ যখন অল্প বয়স ছিল তখন মনে হতো হায় হায় আমি যদি মরে যাই কী হবে! এই পৃথিবীকে দেখতে পাব না। অনুভব করতে, উপভোগ করতে পারবো না। কিন্তু আজকে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে। আমি তো জীবনকে পার করে এসেছি। আমার আর কিসের চাওয়া? এতো দীর্ঘ বয়স পেয়েছি। সেদিন একজন বলছিল যে স্যার আপনারা তো বৃদ্ধ। আমি বলেছিলাম, তোমরা তো যৌবনের

**আমার মৃত্যু চিন্তা শৈশব থেকেই। এখনই বরং কমে গেছে। কারণ যখন অল্প বয়স ছিল তখন মনে হতো হায় হায় আমি যদি মরে যাই কী হবে! এই পৃথিবীকে দেখতে পাব না। অনুভব করতে, উপভোগ করতে পারবো না। কিন্তু আজকে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে**

সমান, আমি সারা জীবনের সমান। আমি সবই পেয়েছি।

**২০০০ : বাকিটা বোনাস?**

আ. আ. সায়ীদ : বোনাস, পেয়ে গেলাম। বন্ধুরা খুশি হচ্ছে।

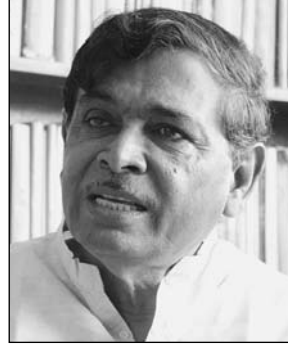
**২০০০ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়ে মানুষ এখন অনেকটা জানে। আমি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কার্যক্রমের একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইবো। 'বাঙালির চিন্তা' নামের একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন। এটা এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে না এলেও ভেতরে ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত কাজটা এগিয়েছে বলে জেনেছি।**

আ. আ. সায়ীদ : গত দুইশ' বছর ধরে বহু মেধাবী বাঙালি, প্রতিভাবান বাঙালি এই জাতির মধ্যে ছিলেন। তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং লিখেছেন। বহু উল্লেখযোগ্য লেখা আছে, যা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। স্বপ্ন দেখাতে পারে। আমরা যেটা করছি, বাঙালির শিক্ষা নিয়ে যতো লেখা আছে সেগুলো পড়ে তার মধ্যে থেকে সেরা লেখাগুলোকে হয়তো ১৫ খণ্ডে বাঙালির শিক্ষা হয়তো ৮০ খণ্ডে বাঙালির সাহিত্য, ২০ খণ্ডে বাঙালির সংস্কৃতি, বাঙালি রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস চিন্তা, ধর্ম চিন্তা এ রকম যতো চিন্তা আছে, পরিবেশ চিন্তা, নারী চিন্তা এ রকম সব মিলে আমরা পৌনে ৩০০

খণ্ডে ৬২০০০ পৃষ্ঠার বই প্রায় শেষ করে ফেলেছি। ১৮ জন সম্পাদক তিন বছর ধরে কাজ করেছেন। এখন যেখানে আটকে গেছি যে আমাদের প্রফ রিডার নেই। এই সমাজে, এটা আমার ধারণার বাইরে। তা না হলে এটা আগামী ছয় মাসের মধ্যে হয়ে যেতো। এখন এক থেকে সোয়া বছর লাগতে পারে।

**২০০০ : এই যে পৌনে তিনশ' খণ্ড, ৬২০০০ পৃষ্ঠা, এটা কি অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে না?**

আ. আ. সায়ীদ : না, প্রতিটি বিষয় আলাদা। যে রিসার্চ করতে চায়, উচ্চতর গবেষণা যে করবে, তার আর হাজার জায়গায় যেতে হবে না। এক জায়গায় সব পেয়ে যাবে। তাদের জন্য এটা স্বর্গ। যারা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহী। যে শিক্ষায় উৎসাহী সে শিক্ষার খন্ডটা রাখলেন। যে সঙ্গীতে উৎসাহী সে সঙ্গীতের খন্ডটা রাখবেন। আমি মনে করি প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে এই পুরো বই থাকা উচিত।



এই বইয়ের মার্কেট কিন্তু শুধু আমাদের দেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও। বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে। পশ্চিমবঙ্গে আরো বেশি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমার কাছে চিঠি লিখেছেন। তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। এতো বড় একটা চিন্তা কিভাবে আমরা করলাম এবং এর বাস্তবায়ন কি করে করছি। আমি তখন তাদের বললাম যে, আমরা এখন এ চিন্তাটা করতে পারি। কারণ বাংলাদেশ এখন একটি রাষ্ট্র। আমাদের চিন্তা এই জাতির সমান।

**২০০০ : কথাটা শুনতে যত সহজ মনে হলো পৌনে তিনশো খণ্ড, কিন্তু এটা তো আসলে অনেক অনেক বড় একটা ব্যাপার। চিন্তাটা করা এবং সেই চিন্তাকে গুছিয়ে এক জায়গায় এনে বাস্তবে তা প্রকাশ করা, আপনি যে ব্যাখ্যাটা দিলেন রাষ্ট্রের, এটা...**

আ. আ. সায়ীদ : হ্যাঁ, কারণ এখন আমরা জানি যে, কি করে একটা জিনিস করতে হয়। যেমন আজ থেকে একশ' বছর আগে যদি জন্মাতাম আমি, তাহলে আমি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র করতাম না। কাগজে বড় বড় প্রবন্ধ লিখতাম। জ্ঞানের উৎকর্ষ হওয়া উচিত, আলোকিত চিত্ত হওয়া উচিত, এটা হওয়া উচিত, ওটা হওয়া উচিত। আমরা এখন আর শুধু প্রবন্ধ লিখছি না। উদাহরণস্বরূপ আমরা সেই কাজটাও করছি। এটা রাষ্ট্র বলেই সম্ভব। আজ থেকে পঞ্চাশ

বছর আগে এটা অকল্পনীয় ছিল।

**২০০০ : এই যে বাঙালির চিন্তা নিয়ে কাজ করছেন, এখানে ধর্মের প্রভাব কতোটা ছিল বা ধর্ম কতোটা বাঙালির জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে?**

আ. আ. সায়ীদ : গত দুশো বছরে, বাঙালি প্রতিভাবান মানুষরা একেবারে ধর্ম চিন্তার বিরুদ্ধে গিয়ে তাদের সমস্ত কাজ করছে। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ধর্ম চিন্তার বিরুদ্ধে। বিদ্যাসাগর ছিলেন সনাতন হিন্দু ধর্ম চিন্তার বিরুদ্ধে। মাইকেল তো ধর্ম ত্যাগই করলেন।

**২০০০ : ধর্মের প্রতি তাঁর কোনো বিশ্বাসই ছিল না।**

আ. আ. সায়ীদ : এদের মধ্যে আবার নিজ নিজ ধর্মের বোধ ছিল। সেটা কিন্তু এই সনাতন, গতানুগতিক বা ধর্মাত্মতা বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়। তাঁরা ছিলেন উদার। রবীন্দ্রনাথ মুসলমান লেখক, হিন্দু লেখক, গত দুশো বছরের এই যে যাত্রা, এটা সেকুলার চিন্তার অগ্রযাত্রা। একটা আধুনিকতা, প্রগতিশীল একটা ভূমিকা ছিল। এতো বড় ভূমিকা যে বলা হতো, What bengals things today, India thinks tomorrow. এই লেখকই তাঁরা। যারা আজকে চিন্তা করেছে আর ইন্ডিয়া তা পরে চিন্তা করেছে।

চিন্তাগুলো আছে, এই বইয়ের মধ্যে থাকবে, তার সমকক্ষ চিন্তা, এ সমস্ত উপমহাদেশ আরেকবার জন্ম দিতে পাঁচশ বছর সাতশ বছরের বেশি লাগবে। এতো বড় হৃদয়ের জাগরণ, চৈতন্যের জাগরণ, মননের জাগরণ, এতো বড় স্বপ্নের জাগরণ এই ইন্ডিয়া, এই সাউথ ইস্ট এশিয়া আবার পাবে কি না আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বই হবে।

**২০০০ : সমস্ত জাতির জন্যই, দীর্ঘ সময়ের জন্য।**

আ. আ. সায়ীদ : অথচ আশ্চর্য হচ্ছে, এতো বড় একটা কাজ আমরা করেছি মাত্র সাতাশ লাখ টাকায়।

**২০০০ : অঙ্কের হিসাবে অনেক কম টাকা। তার মানে যারা এই কাজটা করেছে তাদেরকে অনেক কম টাকা দিয়েছেন?**

আ. আ. সায়ীদ : কম টাকা দেয়া নয়। তাঁরা তো এমনিই ঐ ক্ষেত্রের মানুষ। তাঁদের নিজের আনন্দের সেটা করার কথা। সামান্য কিছু সাপোর্ট দেয়াতে তারা জেগে উঠেছে। পাগলের মতো পরিশ্রম করে তারা এই কাজটা করেছে।

**২০০০ : এই যে সম্পাদকরা কাজ করছেন, এদের নির্বাচন করেছেন কিভাবে?**

আ. আ. সায়ীদ : আমরা এ ক্ষেত্রে কর্মোদ্যম, অপেক্ষাকৃত তরুণদের দিয়ে

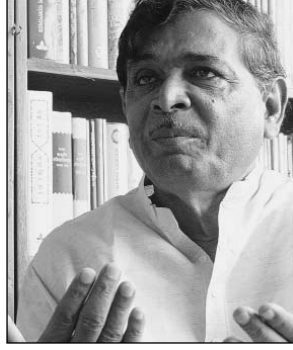
কাজটা করিয়েছি। যারা এই নিজেদের শ্রোথিত চিন্তা-চেতনাগুলো সমাজের মধ্যে সার্কুলেট করতে পারবে। অনেক দিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে। এসব বিষয়ে বক্তৃতা করতে হলে, আলোচনা করতে হলে, পরামর্শ দিতে হলে তারা হবে সেই জলাশয়, যেখান থেকে মানুষ পানি বহন করে নিয়ে যেতে পারবে। আমরা মনে করি এটাও আমাদের একটা বড় লাভ। বইটা তো হলোই, সেই সঙ্গে সমাজে আঠারো জন মানুষকেও আমরা উপহার দিতে পারলাম। যার যার ক্ষেত্রে তারাই শেষ কথা। কারণ পড়তে তো তারা কিছু বাকি রাখেনি।

**২০০০ : ধর্ম আপনাকে কিভাবে প্রভাবিত করে? আপনার জীবনের সঙ্গে ধর্মের সম্পৃক্ততা কি রকম?**

আ. আ. সায়ীদ : এ বিষয়ে এখন কথা না বলাই ভালো। আমি বইয়ের মধ্যে স্পষ্ট করে লিখেছি।

**২০০০ : এর আগে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে যখন আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তখন মোবাইল লাইব্রেরি পুরোপুরিভাবে বিকশিত হয়নি। শুরু হয়েছে, চলছে খুব ভালো মতো। পরবর্তী সময়ে ঢাকার বাইরে, ঢাকায় এবং রাজশাহীতে চলছে। ঢাকায় আরো বেড়েছে। এই মোবাইল লাইব্রেরির আইডিয়া নিয়ে তখন আলোচনা করেছিলাম। এখনকার অবস্থাটা জানতে চাচ্ছি।**

আ. আ. সায়ীদ : মোবাইল লাইব্রেরি খুবই সাকসেসফুল। এটা যে মানুষের কাছে অকুণ্ঠ ভালোবাসা, অভিনন্দন পাবে এটা আমাদের চিন্তার বাইরে ছিল। এতো যে পাঠক এটা আমার ধারণার বাইরে। একটা উদাহরণ দেই। আমাদের দেশের মফস্বলে অনেক লাইব্রেরি আছে। আমি অনেক লাইব্রেরিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি যে পাঠক কতজন? কেউ বলে একশ' কেউ বলে দেড়শ'। খাতায় আছে। জিজ্ঞেস করলাম, সত্যি সত্যি পাঠক ক'জন? যারা নিয়মিত চাঁদা দেয়, বই নিয়ে পড়ে? তখন দেখা গেল কোনো লাইব্রেরিতে ১০ জন, কোনোটাতে ১২ জন, কোনোটাতে ১৫ জন। আমাদের একশ'টা লাইব্রেরি যদি থাকে তাহলে পাঠক এক হাজার জন। একশ'টা ভালো লাইব্রেরি আছে। আর আমাদের একটা গাড়িতে চার হাজার পাঠক। যার তিন হাজার প্রতি মাসে চাঁদা দেয়, নিয়মিত বই নেয়। তার মানে আমাদের একটা ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি বাংলাদেশের সামগ্রিক পাঠকের তিন গুণ। এখন আমাদের পাঁচটা গাড়ি আছে ঢাকায়। এছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীতে আছে। আমাদের ইচ্ছা প্রতিটা জেলায় দুটো করে



গাড়ি থাকবে। সেই গাড়িগুলো সপ্তাহে একদিন জেলা শহরগুলোতে পাড়ায়

আপনার সেই স্বপ্নটা কোন জায়গাটায় ছিল, আর এখন এসে কোথায় মিলেছে। এর মধ্যে কোনো হতাশা কাজ করছে কী?  
আ. আ. সায়ীদ : না, আমার কোনো

বাঙালি প্রতিভাবান মানুষরা একেবারে ধর্ম চিন্তার বিরুদ্ধে গিয়ে তাদের সমস্ত কাজ করছে। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ধর্ম চিন্তার বিরুদ্ধে। বিদ্যাসাগর ছিলেন সনাতন হিন্দু ধর্ম চিন্তার বিরুদ্ধে। মাইকেল তো ধর্ম ত্যাগই করলেন

পাড়ায় বই দেবে। তারপর অন্যান্য দিনগুলোতে থানায়, উপজেলায়, ছোট ছোট শহর-গঞ্জ, বাজার-হাট যতো সংযোগ রাস্তা আছে, তার পাশে গাড়িগুলো থাকবে, ঘুরে বেড়াবে। আমার ধারণা ৩ লাখ সত্যিকারের পাঠক আমরা পাবো।

**২০০০ : এটা আপনি কোন সময়ের কথা বলছেন?**

আ. আ. সায়ীদ : আর ৩-৪ বছরের মধ্যে। আমার ধারণা তিন লাখ সত্যিকারের পাঠক পাওয়া কিন্তু মারাত্মক ব্যাপার। এক লাখ পাঠক আর এক লাখ ফুটবল খেলার দর্শক কিন্তু এক জিনিস নয়।

**২০০০ : এখন মানুষের পড়ার অভ্যাসটা কমে যাচ্ছে। মানুষ ক্রমশ প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। টেলিভিশন, কম্পিউটার এবং নানাবিধ প্রযুক্তির দিকে। সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন তিন লাখ পাঠক পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন, এই প্রত্যাশাটা কি বাস্তবতার সঙ্গে কিছুটা আসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?**

আ. আ. সায়ীদ : এখন আমাদের ড্রয়িংরুমের বিনোদন হচ্ছে টেলিভিশনের ১০০টা চ্যানেল। যার অধিকাংশই অশ্লীল। এগুলো ড্রয়িংরুম দিয়ে ঢুকে বেডরুম দিয়ে বের হয়ে চলে গেছে। আর আমরা বইকে ৩০০ মাইল দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে বলছি যে, মানুষ বই পড়ে না। একজন পাঠক মানে কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার। একজন পাঠক মানে একজন চিন্তাশীল মানুষ, একজন মননশীল মানুষ। ছোটখাটো একজন দার্শনিক। যারা এই দেশকে স্বপ্ন দেখাবে, দিকনির্দেশনা দেবে। পাঠক মানে তো তারাই। যে পড়ে না, সে দিকনির্দেশনা দেবে কেমন করে? সুতরাং সেই পাঠক যদি ২-৩ লাখ হয়, আমাদের পাঠকসংখ্যা তো আরো বাড়ছে। আমরা তো স্কুল কর্মসূচিতে আরো এক হাজার নতুন স্কুলে চলে যাচ্ছি। তো এখানেও হয়তো পৌনে দুই লাখ পাঠক বাড়বে। আমার কিন্তু এ পর্যন্তই। এটুকু করতে পারলেই মনে করবো আমার এই পর্ব শেষ।

**২০০০ : যে স্বপ্ন নিয়ে বা যে লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আপনি গড়ে তুলেছিলেন বা এখনো গড়ে তুলছেন।**

হতাশা নেই। হতাশ হওয়ার শক্তিই নেই। আমি হতাশ হতে রাজি নই এই জন্য যে, হতাশ হওয়া অলাভজনক। আশা লাভজনক। এই যে আমরা সভ্যতার নিচে বসে আছি এর এক ইঞ্চিও হতাশা দিয়ে তৈরি নয়। তাহলে কেন আমি হতাশ হবো? এই দুর্লভ জীবন, একটা মাত্র জীবন, তার মধ্যে যদি হতাশ হয়ে কয়েকটা বছর হারিয়ে ফেলি তাহলে কী করে হবে? আর হতাশা তো মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। কর্মোদ্যমকে নষ্ট করে ফেলে। আমি এতে রাজি নই। প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, স্বপ্ন কিন্তু মানুষের বাড়ে। যখন এক টাকা আছে পকেটে, তখন মানুষ পঞ্চাশ বা একশ' টাকার স্বপ্ন দেখে। যখন একশ' টাকা আসে, তখন হাজার টাকার স্বপ্ন। হাজার এলে লাখ, লাখ এলে কোটি। একদিন আমাদের 'পাঠচক্র' শুরু হয়েছিল ২৫ জন দিয়ে। তারপর একদিন আমার স্বপ্ন সাড়ে তিন হাজারে দাঁড়ালো। সাড়ে তিন হাজারে আসার পর মনে হলো সাত হাজারে যাবো। সাত হাজারে এলে মনে হলো চল্লিশ হাজারে যাবো। এভাবে ধীরে ধীরে তখন আমাদের বই পড়ার কর্মসূচি প্রায় স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'লাখে পৌঁছেছে। এ পর্যন্ত এটুকুই। আমি যদি মোবাইল লাইব্রেরি নিয়ে ৩ লাখ পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারি, আর যদি পৌনে দু'লাখ স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, এটাকেই বিরাট মনে করবো আমি। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, সব মানুষ বই পড়তে পারে না। স্কুল, কলেজ প্রোগ্রাম থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ৪ থেকে ৬ পার্সেন্ট মানুষ বই পড়তে পারে। সারা পৃথিবীতেই এমন। কারণ বই পড়তে তো চিন্তাশক্তি দরকার। এই চিন্তাশক্তিই আছে ৪ থেকে ৬ পার্সেন্ট মানুষের। এর পরের মানুষেরা আরো হালকা জিনিসে চলে যায়। রহস্য উপন্যাসে চলে যায়। প্রেমের উপন্যাসে চলে যায়। এগুলো আর হিন্দি সিনেমার মধ্যে তো ভার্চুয়ালি কোনো পার্থক্য নেই। যে বই মানুষকে স্বপ্ন দেখায়, বড় করে তোলে, তাকে ভাবায়, সে বই পড়ার ক্ষমতা আমি দেখি ৪ থেকে ৬ পার্সেন্ট। এখন যদি বাংলাদেশে ১৪ কোটি লোক থাকে তাহলে ৬% হচ্ছে ৮৪ লাখ পাঠক। এটা সর্বোচ্চ,



যেহেতু আমাদের ২০ ভাগের বেশি লোক ভালো বই পড়ার বিদ্যা রাখে না, সুতরাং ধরতে হবে ২০% হবে ৮৪ লাখের। এর ৬% হলো ১৭ লাখ। তার মানে ১৭ লাখ লোকের কাছে যদি আমি বই নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমি সারা জাতির কাছে বই নিয়ে গেলাম এটা ধরতে হবে।

**২০০০ :** সব আলোচনাতেই বলেন যে, আপনার নানাবিধ পরিচয়ের মধ্যে শিক্ষক পরিচয়টা দিতেই আপনি বেশি পছন্দ করেন। লেখক পরিচয়ের ব্যাপারে কি আপনার অগ্রহ, লোভ কম?

আ. আ. সায়ীদ : না, লেখক পরিচয়ের জন্যই আমার আকৃতি। লেখার সময় আমার হৃদয় যেভাবে বনবান করে বাজে, আর কিছুতে এ রকম হয় না। আমি হয়তো খারাপ লিখি, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু লেখার সময় আমি সবচেয়ে আত্মিক প্রজ্বলন এবং আনন্দ অনুভব করি। লেখার জন্য আমি সব সময় চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি কিছুটা অস্থির

কষ্ট, এতো বাধা, এতো চাপ তার মধ্যেও আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। এটা ঠিক নয় যে, আমার মধ্যে লেখার আকৃতি কম। আমার এখনো মনে হয়, আমি ৫০টা বই লিখবো। যে বইগুলো পাঠযোগ্য। আমার মাথাভর্তি কথা। কিন্তু আমার সময় নেই। কোনো রকম রাতে এসে ১০টার সময় বসি। ১টা পর্যন্ত লিখি। আর দুপুরবেলা যখন সবাই ঘুমায়, আমি সেই সময় ফোনটা বন্ধ করে দুই ঘণ্টা লিখি। এর বাইরে তো আর বেশি লেখা সম্ভব নয়। বোধহয় উচিতও না। একটা মানুষের দিনে ৫ ঘণ্টার বেশি লেখা ঠিক নয়। সে আর লেখক থাকবে না তাহলে।

**২০০০ :** গত কিছুদিনে আপনার যে বইগুলো বেরিয়েছে সেগুলো তো আত্মজীবনীমূলক।

আ. আ. সায়ীদ : আত্মজীবনীমূলক বই-ই আমি লিখছি। এজন্য যে, আত্মজীবনীমূলক বই



**আমার কোনো হতাশা নেই। হতাশ হওয়ার শক্তিই নেই। আমি হতাশ হতে রাজি নই এই জন্য যে, হতাশ হওয়া অলাভজনক। আশা লাভজনক। এই যে আমরা সভ্যতার নিচে বসে আছি এর এক ইঞ্চিও হতাশা দিয়ে তৈরি নয়**

স্বভাবের। তাছাড়া নানা রকম কাজের দায়িত্ব। আমি আবার বিবেকতাড়িত মানুষ। কোনো কাজে যদি বিবেকের কাছ থেকে সাড়া আসে, ডাক আসে তখন আমি আর কিছুই করতে পারি না। এসব করতে গিয়ে নানান কাজে থেকে, আমি আমার লেখার কাজটা আর করতে পারিনি। তবুও কয়েক বছরে তো কিছু বই লিখেই ফেললাম। এখনও প্রাণপণ চেষ্টা করছি। এই যেমন এক মাস পুরস্কার পাওয়ার পর সম্পূর্ণ মাঠে মারা গেল। কিছুই করতে পারলাম না। এ রকমভাবে নানান কাজে, নানান দায়ে সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বয়স বেড়ে যাচ্ছে, সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে যাচ্ছে। তবুও যতটুকু পারি করার চেষ্টা করি। এখন আমার সবচেয়ে বড় মনোযোগ হচ্ছে লেখায়।

**২০০০ :** এই যে বললেন নানা কাজে, সাংগঠনিক কাজে, নানাভাবে বিবেকতাড়িত হয়ে পরিবেশ আন্দোলন করতে যাচ্ছেন। নানাবিধ কারণে সময় চলে যাচ্ছে। এটাকে কি আমরা এক ধরনের অজুহাত বলতে পারি না?

আ. আ. সায়ীদ : এতো বড় শক্তি আমার আসলে নেই। বড় বড় মানুষরা একসঙ্গে ১৫টা কাজ করতে পারে। আমার তো সেই শক্তি নেই। অন্তত আমার যৌবনে ছিল না। এখন আমি পারি। নাহলে আমি এই ২১টা বই লিখলাম কেমন করে, এই কয়েকটা বছরে! আজকে আমি সেটা পারি। এতো

লিখতে আমাকে আর আলাদা করে প্ল্যান করতে হয় না। একটা বিশাল উপন্যাস যদি আমি লিখতে বসতাম তাহলে এটা একটা হোলটাইম জব। সার্বক্ষণিক কাজ। তখন দিন-রাতের মধ্যে আমাকে নিমগ্ন হয়ে থাকা ছাড়া ঐ বই লেখা সম্ভব নয়। যেহেতু আমার ঐ সময় নেই। এ কথা আমাকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেছিলেন যে, ‘আপনি একটা দেড় হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস লিখে যান’। আমি বলেছিলাম যে, ইলিয়াস ওটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব। কারণ, তোমরা শুধু লেখক। আমি তো একজন সংগঠক। আমার পক্ষে তো এই সময় দেয়াটা ঠিক না। তবে আমি আত্মজীবনীমূলক লেখা লিখবো। দেড় হাজার পৃষ্ঠার। এটা আমি তোমাকে কথা দিলাম। ইলিয়াস আজ আর নেই। তাই বিবেকের কাছে আমি আরো দায়বদ্ধতা অনুভব করছি। আমি ইতিমধ্যে এগারোশ’ পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছি। যদি আর এক-দেড় বছর বাঁচি, আশা করছি ষোলো-সতেরোশ’ পৃষ্ঠা লিখে ফেলতে পারবো। বিভিন্ন খণ্ডে যেগুলো আছে, সামগ্রিকভাবে তা এগারোশ’ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হয়েছে। আমার ইচ্ছা ষোলো, সতেরো বা আঠারোশ’ পৃষ্ঠায় গিয়ে এটা দাঁড়াবে। তাতেও হয়তো একটা যুগের চিত্র পাওয়া যাবে।

**২০০০ :** সাম্প্রতিক সময়ের আত্মজীবনীমূলক লেখা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আপনি কী মনে করেন

আত্মজীবনীমূলক লেখায় কতটুকু সত্য থাকা উচিত? কোন সত্যগুলো আসা উচিত, কোন জিনিসগুলো জানা উচিত?

আ. আ. সায়ীদ : আত্মজীবনীমূলক লেখার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবন থাকা উচিত। একজন ব্যক্তির স্বপ্নগুলো থাকা উচিত। মূল্যবোধ, মানব রস থাকা উচিত। সমস্ত দিক থেকে একটা উপভোগ্য সাহিত্যও যেন হয়, আবার আমি কেন বেঁচেছিলাম, কোন স্বপ্ন আমাকে তাড়া করেছিল, কী আমি চেয়েছিলাম, কী পাইনি বলে আমার দুঃখ, এই সমস্ত কথাগুলো আত্মজীবনীতে থাকবে। আত্মজীবনীতে একান্ত ব্যক্তিগত কথাগুলো, যেমন তসলিমা নাসরিনের কথা যদি বলি, এখানে একান্ত ব্যক্তিগত কথাগুলো, বেডরুমের বিষয়গুলো একমাত্র আত্মজীবনীর

বিষয় হয়েছে। হয়তো কখনো সেগুলো আত্মজীবনীমূলক কাহিনীতে থাকতে পারে। কিন্তু একমাত্র ঐজন্যই আত্মজীবনী লেখা হবে এটা ঠিক নয়। আত্মজীবনী অনেক বড় জিনিস। গ্যেটের আত্মজীবনী, রুশোর আত্মজীবনী এগুলো পড়লে দেখা যায় আত্মজীবনী কত বড় হতে পারে। একটা যুগকে, জাতিকে, মানব সভ্যতাকে সেটা প্রভাবিত করতে পারে।

যেমন টলস্টয়ের আত্মজীবনী। আমাদের দেশের মতো সংস্কারবদ্ধ, ধর্মাত্মক মানুষ, ক্ষুদ্রচেতা মানুষ, যেখানে মানুষের আত্মার প্রসার ঘটেনি, মুক্তি আসেনি, সে দেশে একটি সত্য আত্মজীবনী লেখা খুবই কঠিন। মানুষের পক্ষে, শিক্ষকদের পক্ষে, আমাদের দেশে শিক্ষকদের প্রতি এক ধরনের বিশেষ শ্রদ্ধা দেখানো হয়। মানুষ মনে করে যে, কামক্ষুধাহীন একটি মানুষ যেন তিনি হন। কিন্তু মানুষ তো তা নয়। যতই সে নিজেকে সাবলীল মনের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করুক না কেন, মানুষের মধ্যে অনেক লোভ, ক্ষুধা, মোহ, কাম সবই আছে। আমি যতো কথা বলতে পারতাম, যদি আমি শুধু একজন লেখক হতাম তাহলে আমার পক্ষে তা লেখা সম্ভব হতো। শিক্ষক হওয়ার কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছেও না। আমার আত্মজীবনীমূলক লেখাতে মূলত আমার স্বপ্নগুলোকেই তুলে ধরি। সুতরাং ওগুলো হয়তো সে কারণে ততোটা গুরুত্ব পাচ্ছে না।

**২০০০ :** লেখার প্যাটার্নের কারণে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না?

আ. আ. সায়ীদ : এগুলো আমার জীবনের প্রধান ঘটনা নয়। যদিও ওগুলো আমার জীবনেরই ঘটনা। হয়তো কারো জীবনে এটাই প্রধান ঘটনা। তার তো আত্মজীবনীর মধ্যে সেটাই প্রধান ঘটনা হয়ে আসবে।